WBMDFC

KNOWLEDGE SERIES VI

লালন শাহ

মুখবন্ধ

সমাজ ইতিহাসের ধারায় দেখা গেছে কিছু কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়-এর দ্বারা অনন্য হয়ে ওঠেন। সততা, মুক্ত চিন্তা ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাদের ব্যক্তিত্ব নিজ প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ।

‘পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম’ বিগত দিনের বাংলার কয়েকজন মনীষীর জীবন ও কর্মসাধনার বিবরণ একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র ও পুস্তিকার (WBMDFC-Knowledge Series) মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। এদের কর্মসাধনা ও জীবনব্রত পাঠে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অবশ্যই অনুপ্রাণিত হবে বলে আমাদের ধারণা। এই মহৎপ্রাণ মানুষদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমে।

ডঃ পি. বি. সালিম, আই.এ.এস
চেয়ারম্যান
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

ভূমিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা গেছে কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এবং ত্যাগ দ্বারা হয়ে ওঠেন কালজয়ী। মুক্ত চিন্তা ত্যাগ ও মানবজাতির সেবার মাধ্যমে তাদের কাজ চিন্তাভাবনা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম এরূপ মনীষীগণের জীবন ও কর্মসাধনা এ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। WBMDFC- Knowledge Series বিভাগের প্রথম পর্যায়ে চারজন মনীষী হাজি মহম্মদ মহসিন, ডঃ হাসান সোহরাওয়ার্দী, তিতুমির ও ভগিনী নিবেদিতার কর্মসাধনা অতিসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

WBMDFC- Knowledge Series-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো কতিপয় মনীষী যেমন বেগম রোকেয়া, বেনীমাধব বড়ুয়া, স্যার আজিজুল হক এবং লালন শাহ-এর কর্মসাধনা অতিসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা আশা রাখি লালন শাহ সম্পর্কে এই পুস্তিকাটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উপকৃত হবে।

মৃগাঙ্ক বিশ্বাস
ওএসডি এবং এক্স অফিসিও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

লালন শাহ

প্রকাশ কাল
মিলন উৎসব
ফেব্রুয়ারি ২০২২
পরিমার্জিত সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০২৩
জুন ২০২৩

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক দপ্তরের অধীনস্থ একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা)

লালন শাহ

দু-শো বছরেরও আগের কথা। ততদিনে ব্রিটিশরা নিজেদের দখল করা সুবে বাংলার পুরোটা কব্জায় এনে ফেলেছে। নদীয়া জেলা তখন অবিভক্ত। সেই জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার এক ঘন জঙ্গল। পাশের ছেউড়িয়া গ্রামের পথচলতি মানুষজনের কেউ-কেউ ক-দিন ধরেই দেখছিল— সেই জঙ্গলের এক আম গাছতলায় কে-একজন মানুষ কোত্থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

দীর্ঘদেহী। উন্নত ললাট। মাথায় অযত্নের বাবরি চুল। গৌরবর্ণ মুখে বসন্তক্ষত। গালে দাড়ি। উপরন্তু, কারো-বা নজরে পড়েছে— একটা চোখ নাকি তার অন্ধ।

জঙ্গলে মানুষটা নিজের মনেই থাকে। সারাটা দিন নিজের মনেই গান গায়। কী-যে খায়, কেউ জানে না। রাত এলে গাছতলাতেই ঘুমোয়। যেন ওটাই তার ঘরবাড়ি। কারো কারো কানে সেইসব গানের কথা আর সুর পৌঁছেছে। কেউ ভেবেছে— গায় বটে! গানের কী-যে কথা আর ভাব, কী-যে সেসবের মানে— সবটা তারা বোঝে না অবশ্য। তবে সেসব গানের স্বরতরঙ্গ যেন জাদুসাগর থেকে উঠে আসে। বড্ড মন-টানা সেসব গান।

লোকটা কি ফকির? দরবেশ? নাকি সাধু? ঠিক বোঝা যায় না। আর, মানুষটা এলই-বা কোত্থেকে?

ছেউড়িয়া গ্রামের অধিকাংশ মানুষ গরিব। পেশা তাদের তাঁতবোনা। ধর্মে মুসলমান। পদবি কারিকর। তবু তারাও তো মানুষ! আর, অচেনাকে চিনে নেওয়াই মানুষের স্বভাবধর্ম। সেই স্বভাব বশেই এক-দুই করে তারা হাজির হয় আম গাছতলায়। অচেনা সেই মানুষটার কাছে। একরাশ কৌতূহল নিয়ে।

'নাম কী?'— এই প্রশ্নের উত্তরে লোকটা কী বলেছিল? লালন ফকির? লালন সাঁই? নাকি লালন শাহ?

গুরু সিরাজ সাঁই বা সিরাজ শাহের শিষ্যের সেই প্রথম উত্তরটি আজ আর জানা সম্ভব নয়। আর এই অজানা উত্তর নিয়েই আজও সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে তাবড় গবেষকের কৌতূহলের আর প্রশ্নের আর সংশয়ের শেষ নেই।

লোকটার জন্ম-পরিচয় কী? সে কি হিন্দু না মুসলমান?

আজ যখন আমরা দুনিয়া জুড়ে মানুষকে বেশি-বেশি করে চিহ্নিত করতে চাইছি তার ধর্ম-পরিচয় দিয়ে— খ্রিস্টান, ইহুদি, হিন্দু আর মুসলমানের পরিচয় দিয়ে— আমাদের দেশে তার সর্বগ্রাসী সূত্রপাত ব্রিটিশ যুগের সেই শুরুতে। সমাজের উঁচু স্তর থেকে চুইয়ে নামছিল এই বিভাজন-রেখা। তখনো নীচুতলার মানুষ পর্যন্ত পৌছোয়নি ওই বিভাজন। ফলে বাংলার গ্রামকে, সেখানকার তথাকথিত অন্ত্যজনকে স্পর্শও করেনি ততটা। এরই মাঝে মধ্যবঙ্গে, কুষ্টিয়ার এক জঙ্গলে, আম গাছতলায়, আঁটন নিলেন এমন একজন মানুষ, যাঁর প্রকৃত নাম সারা জীবন তিনি রেখেছিলেন গোপনে। বলা উচিত— পিতৃদত্ত নামটিকে তিনি অন্তরের নিভৃত কোণে দুমড়ে-মুচড়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পেরেছিলেন। হতে চেয়েছিলেন মুক্ত। হতে চেয়েছিলেন ধর্ম-পরিচয়হীন এমন এক মানুষ, যে-মানুষ সব মানুষকে কাছে টেনে নিতে পারে।

কে তিনি?

আমরা নির্ভুল ভাবে বলতে পারি শুধু এটুকুই, তিনি— লালন।

কেউ বলেন— লালন ফকির। কেউ-বা লালন সাঁই অথবা লালন শাহ। আবার কেউ বলেন— লালন শা বাউল বা লালন শা ফকির। তিনি নিজেও দীর্ঘ জীবনে কোনো কোনো গানের ভণিতায় কখনো-বা নিজেকে নানা নামের ঘূর্ণিতে অতি-কৌতূহলী মানুষদের ঘুরপাক খাইয়েছেন।

কিন্তু, কী তাঁর আসল পরিচয়? আর কেনই-বা তিনি সে-পরিচয়কে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিলেন?

নানা লালন-গবেষকের সিদ্ধান্তের ভিড় থেকে অধিকাংশ পণ্ডিত যে-মতটিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন, আমরা সেই মতটিই নেব।

২

আনুমানিক ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি উপজেলায় চাপড়া ইউনিয়নের ভাঁড়ারা গ্রামে এক কায়স্থ পরিবারে তাঁর জন্ম। জানা যায়, বাবার নাম মাধব কর, মা পদ্মাবতী। একমাত্র সন্তানটি শৈশবেই পিতৃহীন হলে সংসার বিপাকে পড়ে। শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ লালন পাননি। কী করে দু-বেলা ভাত জোগাড় হবে, কেটেছে সেই ব্যস্ততায়।

চাপড়া-ভাঁড়ারা এলাকাটি ছিল লোকসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র। বলতে কী, গোটা নদীয়া জেলাটাই ছিল আউল বাউল ফকির দরবেশ সাঁইদের বিচরণভূমি। নানা লোকসঙ্গীতের বিশেষ চর্চা ছিল ওইসব অঞ্চলে। ছোটোবেলা থেকে ওইসব গানে লালনের অল্পবিস্তর খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ে। তাতে স্বল্প হলেও কিছু আয়

হত। এরই মধ্যে বিয়েও হয়ে যায় তাঁর। সংসারে থেকেও বরাবর ছিলেন বার-মুখো। জ্ঞাতিদের সঙ্গে বনিবনা না-হওয়ায় মা আর স্ত্রীকে নিয়ে নিজেদের পাড়া ছেড়ে দাসপাড়ায় আশ্রয় নেন। এই ঘটনাটি লালনের জীবনে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। নিজে কায়স্থসন্তান হয়ে দাসপাড়ায় উঠে যাওয়াটা বেশ ইঙ্গিতবাহী।

সেবার দাসপাড়ার একটা দলের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যান তিনি। কেউ বলেন— বহরমপুরে, কেউ বলেন— নবদ্বীপে, কেউ-বা বলেন— শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলেন তীর্থ করতে। যা-ই হোক, ফেরার পথে লালন বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। রোগ গুরুতর আকার নিলে তিনি অচৈতন্য হয়ে যান। সঙ্গীরা মৃত ভেবে লালনকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। ভাঁড়ারায় ফিরে তারা বাড়িতে খবর দিলে সন্তানহারা মা আর স্বামীহারা স্ত্রী পড়েন অকূল পাথারে।

এদিকে ভাসতে ভাসতে লালনের সংজ্ঞাহীন দেহ নদীর কূলে ভিড়লে তন্তুবায় এক মুসলমান মহিলা তাঁকে জল থেকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যায়। সেই মহিলার দিবারাত্রি শুশ্রূষায় সুস্থও হয়ে ওঠেন লালন। কিন্তু সুস্থ হলেও বসন্তরোগে একটা চোখ যায় নষ্ট হয়ে।

বাড়ি ফিরলে মা আর স্ত্রী 'মৃত' লালনকে দেখে চমকে ওঠেন। এই অবিশ্বাস্য আগমনে তাঁরা আনন্দে বিস্ময়ে বিমূঢ়। কিন্তু, জ্ঞাতিরা একজোট হয়ে রুখে দাঁড়ায়। লালনকে সমাজচ্যুত করে। তাদের অভিযোগ— মুখাগ্নি হয়েছে যার, মুসলমানের জলগ্রহণ করেছে যে, সমাজে তার স্থান নেই। সে মৃত।

সমাজের এই নিদান শুনে শাস্ত্রীয় আচার, জাতি-ধর্ম, সমাজ-সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ লালনের মন বৈরাগ্য জগতের দিকে ধাবিত হয়। বেরিয়ে পড়েন অজানার উদ্দেশে। পিছনে পড়ে থাকে

রোরুদ্যমানা মা আর স্ত্রী। আর, তাঁর অন্তরে ধ্বনিত হয়—

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে
লালন কয়— জাতের কী রূপ
দেখলাম না এই নজরে।।

সেই যে তিনি ছাড়লেন সমাজের সমস্ত বাঁধন, তারপর বিধিনির্দেশিত কোনো সমাজ সারা জীবন আর তাঁকে বাঁধতে পারেনি। সমাজপতিদের সেই মর্মান্তিক আঘাত লালন জীবনে ভুলতে পারেননি। পরে বহু গান তিনি বেঁধেছেন, যে-সব গানে সাম্প্রদায়িক জাত-ধর্ম আর গোত্র-কুল সম্বন্ধে তাঁর তীব্র অনীহা ফুটে উঠেছে। সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে বরং নিজেই তিনি তৈরি করতে চেয়েছেন এমন এক সমাজ, যে-সমাজ প্রচলিত বিধি মানে না। যে-সমাজ ডানা ছড়িয়ে মুক্ত আকাশে উড়তে চায়। পিছনে পড়ে থাকে বদ্ধ জলাশয়ের মতো এক জগৎ, যেখানে

জগৎ জুড়ে জাতের কথা
লোকে গল্প করে যথা-তথা
লালন বলে জাতের ফাতা
ডুবাইছি সাত-বাজারে।

লালনকে যখন গৃহত্যাগ করতে হয়, তখন তিনিজীবনের মধ্যভাগে। তত দিনে বিতৃষ্ণা জন্মেছে সমস্ত রকমের শাস্ত্রীয় ধর্মের প্রতি। সমাজত্যাগী লালন ঘুরতে ঘুরতে সিরাজ সাঁই নামের তত্ত্বজ্ঞ এক সিদ্ধ সাধকের কাছে উত্তর পেলেন তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার। এই বাউল সাধকের কাছেই তিনি দীক্ষা নেন। বলা হয়— সিরাজ সাঁইয়ের কাছে দীক্ষা নেওয়ার সময়েই লালন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এ ঘটনায় আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা, জীবনে যে-আঘাত তিনি পেয়েছেন শাস্ত্রীয় ধর্মের কাছে, তার প্রতিক্রিয়ায় কারো কারো জীবনে এমনটা ঘটতে পারে।

বাউল মতে দীক্ষা নেওয়ার পর লালন কোনোরূপ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের দিকে আর ফিরে তাকাননি। তাঁর নিজের কথায়— জাত-ধর্মকে তিনি বেচে দিয়েছেন সাত-বাজারে।

সবে বলে লালন ফকির কোন জাতের ছেলে।
কারে বা কী বলি আমি দিশে না মেলে।।

কিন্তু, সিরাজ সাঁই কোথাকার মানুষ?

এ নিয়েও একাধিক মত আছে। সমস্ত পণ্ডিতদের মতামত বিবেচনা করে আমরা বলতে পারি— কাহার সম্প্রদায়ভুক্ত এই সাধক ছিলেন বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার হরিশপুর অথবা যশোর জেলার ফুলবাড়ি অথবা ফরিদপুর জেলার কালুখালি অথবা কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালির মধ্যে কোনো-একটি গ্রামের মানুষ। তালিকাটির ব্যাপ্তি চার জেলা জুড়ে। একজন প্রকৃত বাউলের সন্ধান হয়তো-বা এমনই অপার স্থানে ঘুরে ঘুরে পেতে হয়।

গুরু সিরাজ সাঁইয়ের কাছে বাউল ও ফকিরি মতে শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ হলে গুরুর নির্দেশে লালন আসেন বর্তমান কুষ্টিয়া শহরের কাছাকাছি ছেউড়িয়ায়। ঘর, পরিজন ছেড়ে আশ্রয় নেন পার্শ্ববর্তী এক জঙ্গলে।

তখন বাংলা ১২৩০ সাল, ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ। লালনের বয়স প্রায় ৪৮ বছর।

৩

এই সেই নদীয়া জেলা। লালনের তিনশো বছর আগে এই জেলাতেই জন্মেছিলেন চৈতন্যদেব। জন্ম দিতে চেয়েছিলেন এক বিপ্লবের। ছুৎ-অচ্ছুতের, উচ্চ-নীচের, ধনী-দরিদ্রের, হিন্দু-

মুসলমানের ভেদরেখা মুছে দিয়ে মানব-প্রেমের এক নতুন স্রোতের, নতুন জীবনচর্যার জোয়ারে তিনি ভাসিয়েছিলেন আপামর মানুষকে। সে-জোয়ারের পরিস্থিতি যেন অনেক আগেই তৈরি হয়ে ছিল বাংলার জল-হাওয়ায়। তখন এমন এক আবহের সৃষ্টি হয়েছিল ছিল যে, চৈতন্যদেবের জন্মের আগেই কবি চণ্ডীদাস লিখে ফেলেছেন—

সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

এই সেই নদীয়া জেলা, যে-অঞ্চলের পাড়ায় পাড়ায় লোকায়ত ধর্মের আর জীবনযাপনের ঐতিহ্য বহু শতাব্দীর। নিম্নবর্গের মানুষের গীতি-উচ্ছ্বাসের সুরে আর ধ্বনিতে নদীয়ার কুষ্টিয়ার যশোরের আকাশ-বাতাস একদা প্লাবিত হয়েছে। কিন্তু, সেই অঞ্চলেই উনিশ শতকের শুরুতে এসে দেখা যাচ্ছে— ফের জাঙ্গাল জমেছে সমাজে। জেগে উঠেছে সমাজপতিরা।

এ দেশে সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে ছুঁৎ-মার্গ ও জাতিভেদপ্রথা দুষ্ট ক্ষতের মতো সর্বকালে দগদগে হয়ে ছিল। যুগে যুগে মরমী সাধক ও ধর্মসংস্কারকরা এসবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। কিন্তু মানুষের মনে এইসব সংস্কার ও বিভেদ বরাবর এমন ছাপ ফেলে রেখেছে যে, সমূলে তাকে উৎখাত করা দুঃসাধ্য কাজ। এমনকি চৈতন্যদেবের সংস্কারসাধনও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি।

অথচ, প্রকৃতি এমনই শিক্ষা দেয় যে, ক্রমাগত স্রোত না-থাকলে নদী যেমন বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়, সমাজেও সংস্কার আন্দোলন থেমে গেলে আবার ফিরে আসে পুরোনো উপসর্গগুলো। জমে কচুরিপানা। বিধিনিষেধের শেকলে বাঁধা পড়ে মানুষ। নিষ্পিষ্ট হয়।

এবারও তেমনই হল ভাঁড়ারা গ্রামে। বিনা দোষে লালনকে ছেড়ে যেতে হল স্ত্রী আর মায়ের মতো আত্মজন। ছেড়ে যেতে হল নিজের গ্রাম, ঘরবাড়ি— সব কিছু। ক্ষোভে, দুঃখে, যন্ত্রণায় লালন তখন খুঁজতে শুরু করেছেন সেই জগৎ, যে-জগতে কেউ কিছু খুঁজছে—

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
বাড়ির কাছে আরশিনগর পড়শি বসত করে।
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি
নাই কিনারা, নাই তরণী পারে।।

নিজের ফেলে-আসা গ্রাম থেকে হাজার মাইল দূরে নয় হয়তো, কিন্তু মানস-দূরত্ব বহু আলোকবর্ষের। সেখানে আশ্রয় বলতে একটি বৃক্ষতল। আর তার ছায়া। চারদিকে 'অগাধ পানি'। তার কিনারা নাই। তরণীর চিহ্ন মাত্র নাই।

৪

সেই-যে আম গাছতলায় আশ্রয় নিলেন, জঙ্গল থেকে বেরোতেন না। একাগ্রচিত্তে সাধনায় ডুবে থাকতেন। খিদে পেলে খেতেন আনমেল নামের এক ধরনের কচু, যা ওই অঞ্চলের জঙ্গলে সহজলভ্য।

ছেউড়িয়ায় খবরটা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল। এক-দুই করে ছেউড়িয়ার কারিকর সম্প্রদায়ের মানুষ কাছে আসতে লাগল। ফকিরকে দেখে, তাঁর তত্ত্বকথা শুনে, আকৃষ্ট হল তারা। দিন দিন লালনের প্রতি কারিকর সম্প্রদায়ের মানুষের ভক্তি বাড়তে লাগল।

অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, প্রায় প্রতিটি পরিবারেই ছিল লালনের শিষ্য। তেমনই এক শিষ্য মলম শা কারিকর সাড়ে ১৬ বিঘা জমি দান করেন। এই জমির অর্ধাংশে, ফকিরের অনুমতি নিয়ে, তারাই বানিয়ে দেয় একটা আখড়া। এবং মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল সেই আখড়ার কথা— যেটি কালক্রমে হয়ে উঠল লালন শাহ ফকিরের আখড়া।

এই মুসলমান কারিকর সম্প্রদায়ের আন্তরিক সহযোগিতায় লালনের প্রভাব আশপাশ এলাকায় দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরে পাশের জেলাগুলোতেও বাড়তে থাকে শিষ্য-অনুগামীর দল। ছেউড়িয়ায় তাঁর থাকা হত কম। পাবনা, রাজশাহি, যশোর, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় ঘুরতেন শিষ্যদের নিয়ে। প্রচার করতেন তাঁর মতবাদ। সে-মতবাদ কেমন? জাতিধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে এক সমন্বয়বাদী তত্ত্বের কথা সারা জীবন তিনি প্রচার করেছেন। গানে তিনি বলছেন—

আরবিতে আল্লা বলে
পারশিতে কয় খোদাতালা
গড বলেছে যীশুর চেলা
ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভেবে।

আল্লা হরি ভজন পূজন
মানুষের সকল সৃজন
অচানক অচিনা কখন
জ্ঞান ইন্দ্রিয় না সম্ভবে।

তাঁর কথায় আর গানে দীন-দরিদ্র-সচ্ছল যেমন, তেমনই হিন্দু-মুসলমান বিভেদ ভুলে একাকার হয়ে গিয়েছিল। বলা হয়—

আশপাশের বিরাট এক এলাকায় লালনের শিষ্যসংখ্যা ছিল অন্তত দশ হাজার। এই দলে মুসলমানদের ছিল আধিক্য। আর ছিল নিম্নবর্গের হিন্দুরা। এদের সব্বাইকে বলা হত— 'নেড়ার ফকির'। অথচ তাঁর কোনোরকম লেখাপড়া ছিল না।

কিছুকাল পর এখানকারই এক মুসলমান তাঁতিনী বিধবাকে নিকাহ করেন তিনি। ছোটোখাটো এক পানের বরোজ বানিয়ে তাতেই তাঁদের সংসার নির্বাহ হত। কিন্তু ফকিরকে প্রায়শই দেখা যেত না। তিনি নির্জনে সাধনকর্মে ডুবে থাকতেন আর গান রচনায় থাকতেন মগ্ন। বেঁধে যাচ্ছেন—

আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
সে কি আর জপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।।
অথবা বাঁধছেন—

মনের মানুষ থাকে মনে
বলব না তা কারো সনে
তার ঋণ শুধিব কোন দিনে
মনে সদায় সে চিন্তা।

এমন সব তত্ত্বকথায় সমৃদ্ধ গান বাঁধতেন আর সেসব গান শিষ্য থেকে প্রশিষ্যবাহিত হয়ে আজও বাংলার হাটে মাঠে প্রান্তরে মেলায় আমাদের মনের অন্দরের কোনো সুপ্ত চেতনাকে আন্দোলিত করছে।

লালন মুখে মুখেই পদ রচনা করতেন। মনে নতুন গান উদয় হলে শিষ্যদের ডেকে বলতেন- 'পুনা মাছের ঝাঁক এসেছে। রচনা শেষ হলে গাইতেন নিজেই। শিষ্যরা কেউ কেউ সেসব গান লিখে

রেখেছেন। লিপিকরের এই কাজটি করতেন মানিক শাহ ওরফে মানিক পণ্ডিত আর মনিরুদ্দিন শাহ। এই লিখে রাখাটা লালনের মোটেই পছন্দ ছিল না। তিনি বলতেন— 'লিখিস না, লিখিস না। সিনায় (অন্তরে) রাখ।'

লালনের জীবিতকালে খাতাগুলি ছিল ছেউড়িয়ার আখড়াতেই। কিন্তু ক্রমে সেসব খাতা বেহাত হতে থাকে। বেশ কিছু পরে দু-টি খাতা নিয়ে আসেন রবীন্দ্রনাথ। সে-খাতা দু-টি এখন রয়েছে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে।

কত গান বেঁধেছিলেন লালন শা ফকির? ভক্তরা বলেন— দশ হাজার তো হবেই! অনুসন্ধানীরা খোঁজখবর করে দেখেছেন— সংখ্যাটা বড়োজোর হাজার খানেক। কিন্তু সংখ্যা দিয়ে কি লালন ফকিরকে মাপা যায়? যদি আমরা জানতে চাই— লালনের মতাদর্শ কী ছিল? উত্তরে বলতেই হবে— সব তাঁর গানের কথার অন্তরালে আছে। লালন কী বিশ্বাস করতেন, কী তাঁর ধর্মমত, জীবনপ্রণালী— সব কিছুই তাঁর অসাধারণ গানের অন্তর্গত দিব্যকথার মধ্যে বিরাজিত। আজও যখন কেউ গেয়ে ওঠেন লালনের গান, বোঝা এবং না-বোঝার মাঝে দোদুল্যমান শ্রোতা সুরের টানে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যান লালনের সেই অধরা জগতে।

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনোবেড়ি
দিতাম পাখির পায়।।

আট কুঠুরী নয় দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা।
তার উপরে সদর কোঠা
আয়নামহল তায়।।...

যেমন ধরা যাক এই বিশেষ গানটির কথা। এমনিতে লালনের গান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এমনই মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি নিজে বহু কষ্টস্বীকার করে এই সাধকের গান সংগ্রহ করেছিলেন। 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩২২ সালে ছাপিয়েছিলেন এবং লালনগীতি সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গে টুকরো টুকরো লিখেছিলেন। যেমন, 'গোরা' উপন্যাসে তিনি লিখছেন— 'আলখাল্লা-পরা একটি বাউল দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল—

খাঁচার ভিতর অচিন-পাখি কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনো-বেড়ি দিতেম পাখির পায়।'

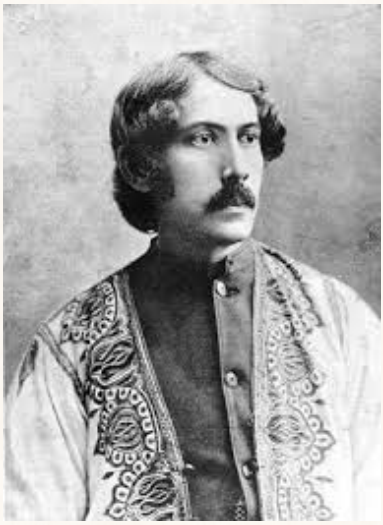

‘জীবনস্মৃতি’-তে এই গানটিরই উল্লেখ করে লিখছেন— ‘মাঝে মাঝে বন্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়। মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পারে না।’ সরাসরি সাহিত্য-স্বীকৃতিও দিয়েছেন ‘বাংলা ছন্দের প্রকৃতি’ প্রবন্ধে।

আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
সে কি আর জপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।
এমন মানব-জনম আর কি হবে
যা কর মন ত্বরায় কর এই ভবে।।

লালনের ভণিতা-সহ সম্পূর্ণ গানটি উদ্ধৃত করে তিনি লিখছেন— ‘এই ছন্দের ভঙ্গি একঘেয়ে নয়। ছোটো-বড়ো নানা ভাগে বাঁকে-বাঁকে চলেছে। সাধু প্রসাধনে মেজে ঘষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো।’

এছাড়া ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসে লালন-দর্শন সম্বন্ধে এক ভাষণে কবি বলেন— 'That this unknown is the profoundest reality, though difficult of comprehension is equally admitted by the English Poet as by the nameless village singer of Bengal, in whose music vibrate the wing-beats of the unknown bird.

ছেউড়িয়ায় আসার আগে লালনের জীবন ছিল অস্পষ্ট, ফলে সেই অধ্যায়ে অনেক কল্পকাহিনি ঢুকে পড়েছে। কিন্তু এখানে আসার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত লালনের জীবনের বেশ কিছু ঘটনা একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি।

৫

তখন তাঁর নাম এবং কর্মপ্রবাহ ছড়িয়ে পড়েছে। কিছু শিক্ষিত আর বিখ্যাত মানুষজনের সঙ্গে পরিচয় এবং কারো কারো সঙ্গে এমনকি বন্ধুত্বও হয়েছে। যেমন বহু-আলোচিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'-র সম্পাদক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, 'বিষাদ সিন্ধু'-খ্যাত লেখক মীর মশাররফ হোসেন, অক্ষয়কুমার মৈত্র, জলধর সেন। এমনকি জমিদারির তত্ত্বাবধানে শিলাইদহে গিয়ে পদ্মা বোটে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে ডেকে পাঠান। লালনের তখন শেষ বয়স। মৃত্যুর বছরখানেক আগের ঘটনা সেটা। ১৮৮৯ সালের ৫ মে। হাতে লাঠি। দীর্ঘ শরীর ন্যুব্জ হয়ে গুটিয়ে গেছে। সুদৃশ্য চেয়ারে সামনে বসিয়ে নিজে লালনের একটি প্রতিকৃতি আঁকেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। জীবদ্দশায় ওটিই লালনের একমাত্র প্রতিকৃতি, যা সময়কে পরাজিত করে আজও রয়ে গেছে।

তবে, লালন সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ আমরা পাই ১৮৭২ সালে—কাঙাল হরিনাথের 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'-য়। ওই পত্রিকায় 'জাতি' নামক এক নিবন্ধ ছাপা হয়। তাতে লেখকের নাম ছিল না। সেই নিবন্ধে লেখা হয়—

লালন শা নামে এক কায়স্থ আর এক ধর্ম আবিষ্কার করিয়াছে। হিন্দু মুসলমান সকলেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত।... ৩/৪ বৎসরের মধ্যে এই সম্প্রদায় অতিশয় প্রবল হইয়াছে। ইহারা যে জাতিভেদ স্বীকার করে না সেকথা বলা বাহুল্য।

পরে অবশ্য কাঙাল হরিনাথের সঙ্গে লালনের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন লালনের পরম শুভার্থী। তাঁর পাক্ষিক পত্রিকা 'হিতকরী'-তে লালন-বিষয়ক একাধিক সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে। এই দুই পত্রিকায় প্রকাশিত নানা খবরে আমরা জানতে পারি লালন ফকিরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। যেমন ১৫ কার্তিক ১২৯৭, ৩১ অক্টোবর ১৮৯০ সংখ্যায় ছাপা হয়—

'তিনি ধর্মজীবনে বিলক্ষণ উন্নত ছিলেন বলিয়া বোধহয়। মিথ্যা জুয়াচুরিকে লালন ফকীর বড়ই ঘৃণা করিতেন। নিজে লেখাপড়া জানিতেন না; কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁহাকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোন শাস্ত্রই পড়েন নাই; কিন্তু ধর্মালাপে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত। বাস্তবিক ধর্মসাধনে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না। লালন নিজে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বী ছিলেন না। অথচ সকল ধর্মের লোকেই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত... সময় সময় যে উচ্চ-সাধনের কথা ইহার মুখে শুনা যাইত, তাহাতে তাঁহার মত ও সাধন সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইত। যাহা হউক তিনি একজন পরম ধার্মিক ও সাধু ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই।

এমন যে মানুষ, তিনি সাংসারিক জগতের সর্বস্ব ত্যাগ করে শুধু মাত্র সাধনাতেই ডুবে থাকতেন, তেমনটা নয়। বরং, সমাজের কাঠামো আর তার আঁটো বাঁধন, উচ্চ-নীচ আর ধনী-দরিদ্র ভেদ— সব দিকে তাঁর পূর্ণ নজর ছিল।

সেটা কেমন?

৬

প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ জীবনে পাননি। শিক্ষা বলতে গুরু সিরাজ সাঁইয়ের শিষ্যরূপে তাঁর নিবিড় সান্নিধ্য। বাংলার বাউলতত্ত্বের নিগুঢ় পরিচয়লাভ এবং সেই তত্ত্বে আবাহন।

আছে ভাবের ঘরে তালা
সেই ঘরে সাঁই বাস করে
ভাব দিয়ে খোল ভাবের তালা।
দেখবি সেই মানুষের খেলা
ঘুচে যাবে মনের ঘোলা
থাকলে সে রূপ নিহারে।।

তবু শুধু ভাবেরই সঙ্গে বসবাস নয়, ছেউড়িয়ায় নিজের সংসারের প্রতিপালনও করতেন সাধক লালন। যদিও শিষ্যদের অকাতর সাহায্য জুটেছে বরাবর, লালন কারো সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকাকে অপছন্দ করতেন। দশ হাজারেরও বেশি সদস্য। তাদের একত্র রাখা, সুপথে চালানো, কম ঝক্কির ব্যাপার নয়।

ভাঁড়ারায় স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছিল আগেই। দূর থেকে সাধ্য মতো মায়ের প্রতি পুত্রের কর্তব্যপালন করেছেন। মায়ের মৃত্যুর পর আখড়া থেকে সমস্ত সামগ্রী পাঠিয়ে পারলৌকিক কাজকর্ম যথাবিধি সম্পন্ন করেছেন।

অন্তরে ছিলেন ফকির। কিন্তু বিষয়ের প্রতি বিন্দুমাত্র আসক্তি না-থাকলেও, বিষয়-বুদ্ধি এবং সাংসারিক বিবেচনার পরিচয় আমরা পাই মৃত্যুর আগে তাঁর দানপত্রে। যৎকিঞ্চিত সম্পদ যা ছিল, সেসব স্ত্রী, পালিত কন্যা আর শীতল-নামে এক শিষ্যকে নির্দিষ্ট পরিমাণ দিয়ে বাকি সবটা সৎকাজে ব্যবহারের জন্য নির্দেশ দিয়ে যান।

এছাড়াও শিষ্যদের সুখে-দুঃখে থাকতেন। শুধু মনের মানুষের সন্ধানে তাঁর মন যে ছুটে বেড়াত না; দুর্বলের পাশে, নিপীড়িতজনের পাশে তিনি দাঁড়াতেন, তার প্রমাণও পাওয়া যায়।

'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকাটি ছিল নির্ভীক। দরিদ্র আর শোষিতজনের পক্ষে। পত্রিকাটি জমিদারদের প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে কলম ধরতে পিছপা হত না। ওই অঞ্চলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির জমিদারি ছিল বিশাল এলাকা জুড়ে। ঠাকুরবাড়ির প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে লিখে সম্পাদক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার একবার ঠাকুরদের বিষ-নজরে পড়েন। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, শিলাইদহের কাছারিবাড়ি থেকে লেঠেলবাহিনী পাঠানো হয় কাঙাল হরিনাথকে উচিত শিক্ষা দিতে। খবর পেয়ে লালন শা শিষ্যদের নিয়ে এগিয়ে আসেন বিপন্ন বন্ধু হরিনাথকে সাহায্য করতে। যে-হাতের একতারা মরমি গানের সুরমূর্ছনায় মুখরিত হয়, সেই হাতেই উঠেছে প্রতিরোধের লাঠি।

শান্ত, সৌম্য, নির্লিপ্ত সাধক লালনের এ এক অন্য রূপ, যা তাঁর সরলরৈখিক চরিত্রকে ভেঙে দিয়ে নির্মাণ করে নতুন এক ছবি।

এই ছবি থেকে যে-লালনকে আমরা চিনতে পারি, তৎকালে সেই লালনের সামাজিক ভূমিকাটি অস্বীকার করা যায় না। কেননা, জীবনসংগীতের মরমি সাধক হলেও লালন ছিলেন যুক্তিবাদী। আর ছিলেন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। যার ফলে বাহ্যিক ব্যাপার ছাড়িয়ে যেত তাঁর ভাবনা। আর তারই প্রকাশ তাঁর গানে। মূলত গানের মধ্য দিয়েই লালন করে গেছেন মানবসাধনা।

কলকাতাকেন্দ্রিক নবজাগরণ যখন সমাজের উচ্চ-নীচ ভেদকে দূর করতে পারেনি, হিন্দু-মুসলমানকে পারেনি একত্র করতে, সেই সময় জাগরণের ওই নাগরিক প্রয়াসের বিপরীতে

গ্রামবাংলায় নিভৃতে চলছিল জাগৃতির প্রয়াস। বাউল গানে, বিশেষ করে লালনের সাধনা ও গানে, এই প্রয়াস হয়ে উঠেছিল জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের মিলনের প্রয়াস। নবজাগরণের অন্যতম শর্ত যে অসাম্প্রদায়িক মানববাদ, তা এই অশিক্ষিত গ্রাম্য সাধকদের বাণী, সাধনা ও কাজের ভেতরেই সত্য হয়ে উঠেছিল। আর, বলা যেতে পারে— লালন শাহ ফকিরই ছিলেন সেই সময়ের প্রাণপুরুষ।

৭

তবু, সব কিছুরই শেষ আছে।

দিনটি ছিল শুক্রবার। সময় ঊষাকাল। ১ কার্তিক, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ। ইংরেজি মতে— ১৭ অক্টোবর, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ।

সারা রাত শিষ্য আর ভক্তরা সবাই জেগে। শেষ শয্যায় শায়িত তিনি ফিরে-ফিরে গাইছেন—

পার করো হে দয়ালচাঁদ আমারে।
ক্ষমো হে অপরাধ আমার ভব-কারাগারে।

একসময় মরনোন্মুখ কণ্ঠের গান থেমে গেল। শোনা গেল তাঁর শেষ উচ্চারণ— 'আমি চললাম।'

এর পনেরো দিন পর পাক্ষিক ‘হিতকরী’ পত্রিকা প্রথম সংবাদটি ছাপে। পত্রিকাটি জানায়— ভোর ৬টায়, ১১৬ বছর বয়সে, ছেউড়িয়ার আখড়ায় সজ্ঞানে তিনি দেহত্যাগ করেন। শুধু মৃত্যুসংবাদ নয়। লেখাটি ছিল দীর্ঘ। লালনের সারা জীবনের পর্যালোচনা। এক মহান মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। আর, সেই শ্রদ্ধার্ঘ্যের শিরোনাম ছিল— ‘মহাত্মা লালন ফকির’।

তাঁর নির্দেশ মতো নিজের বাসগৃহেই লালনকে সমাধিস্থ করা হয়। কোনো পারলৌকিক অনুষ্ঠান করা হয়নি। আজ সেখানে শোভা পাচ্ছে শ্বেতশুভ্র সুদৃশ্য মাজার। দেশ-বিদেশের অগণিত মানুষ সেখানে যান তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে।

তথ্যসূত্র

১। মহাত্মা লালন ফকির : বসন্তকুমার পাল, শান্তিপুর-নদীয়া, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

২। লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০) : আবুল আহসান চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০।

৩। লালন স্মারকগ্রন্থ (সম্পাদনা: আবুল আহসান চৌধুরী), ঢাকা, চৈত্র ১৩৮০।

৪। বাংলার বাউল : ক্ষিতিমোহন সেন, কলকাতা, ১৯৫৪।

৫। ব্রাত্য, মন্ত্রবর্জিত লালন ফকির : সুধীর চক্রবর্তী, চতুরঙ্গ, বর্ষ ৫২, সংখ্যা ৬, অক্টোবর ১৯৯১।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

একরাম আলি

Helpline

1800 120 2130

Visit Us at

http://www.wbmdfc.org/

WEST BENGAL MINORITIES' DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION

(A Statutory Corporation of Govt. of West Bengal)

"AMBER" DD-27/E, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-700064